ইউনিট ৫

ভাইরাস
(VIRUS)

ভূমিকা

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। কিছু খালি চোখে আর কিছু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পারি। কিছু আছে অকোষীয়, কিছু কোষীয়। অকোষীয় যেমন ভাইরাস। এ ইউনিটে ভাইরাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

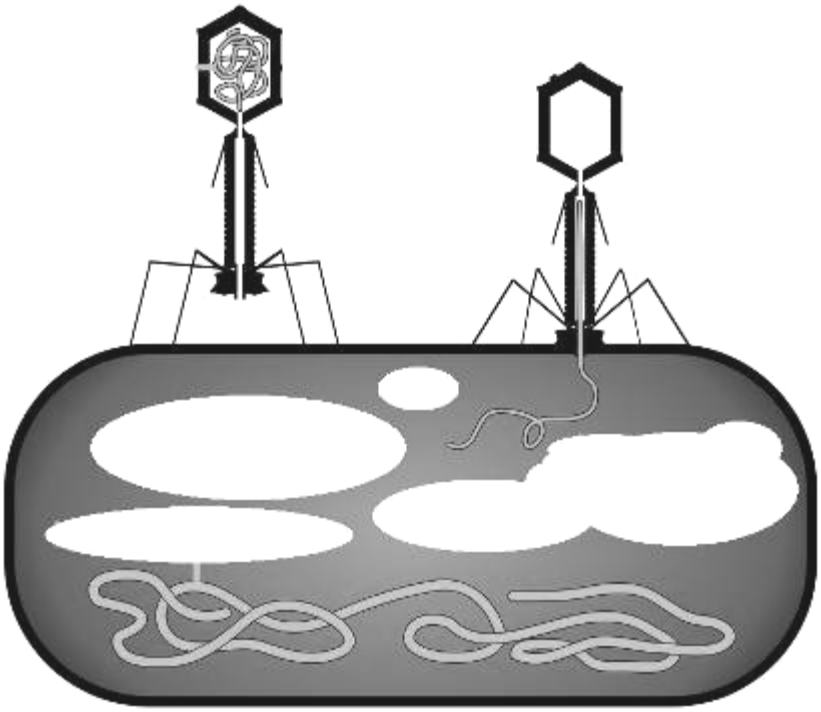

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১.৫ সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ ৫.১ : ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব পাঠ ৫.২ : ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবন চক্র পাঠ ৫.৩ : পেঁপের রিং স্পট রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়	

পাঠ-৫.১ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাইরাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকার গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	T_2 ব্যাকটেরিওফায, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস

ভাইরাস : সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, জলাতঙ্ক, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের কথা প্রায়ই আমরা শুনে থাকি, কখনও নিজেরাই আক্রান্ত হই। এগুলো সবই ভাইরাসজনিত রোগ। মানুষের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীসহ গাছপালারও ভাইরাসজনিত রোগ হয়। তাহলে ভাইরাস কী ? বিষয়টি আমাদের জানা দরকার।

ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বিষ। আদিকালে রোগ সৃষ্টিকারী যে কোনো বিষাক্ত পদার্থকেই ভাইরাস বলা হত। এরা অকোষীয় এবং আকারে এতই ছোট যে খালি চোখেতো দূরের কথা, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না। এদেরকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড (যা কেন্দ্রে থাকে) ও প্রোটিন (যা আবরণ হিসেবে থাকে) দিয়ে গঠিত অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয় এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে তথায় রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে। আবার বায়ু, মাটি, পানি ইত্যাদি জড় মাধ্যমে ভাইরাস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। কাজেই ভাইরাস জীব এবং জড় উভয় অবস্থায় অবস্থান করে।

অ্যাডল্ফ মেয়ার (Adolf Mayer) ১৮৮৬ সালে সর্বপ্রথম তামাক গাছের মোজাইক রোগের কারণ বর্ণনা করেন। তিনি তামাক গাছের পাতায় ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পান। পাতাগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। পাতার দাগগুলো ছিল মোজাইক এর ন্যায়। তাই তিনি এ রোগের নাম তামাকের মোজাইক রোগ বলে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি আইভানোভসকি (১৮৯২) গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন- তামাক গাছের মোজাইক রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া হতে ক্ষুদ্র আকারের। আমেরিকান বিজ্ঞানী স্ট্যানলি (Stanley) ১৯৩৫ সালে তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাসকে পৃথক করে কেলাসিত করেন। তিনি সে জন্য ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানী এন. ডব্লিউ. পিরি (N.W.Piri) এবং এফ. সি. বাওডেন (F.C.Bawden) ১৯৩৭ সালে ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং বলেন নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে ভাইরাস দেহ গঠিত।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য : ভাইরাস কখনও জীবের ন্যায় আচরণ করে। আবার কখনও জড়ের ন্যায় আচরণ করে। তাই ভাইরাসে জীব এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। যেমন-

ভাইরাসে জীব বৈশিষ্ট্য

- ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA বা RNA থাকে।
- পোষক কোষের অভ্যন্তরে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।
- এতে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটতে দেখা যায়।
- ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে এবং প্রকরণ তৈরি করতে সক্ষম।
- নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মূল ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস জন্ম দিতে পারে।

- ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবি।

ভাইরাসে জড় বৈশিষ্ট্য

- ভাইরাস অকোষীয়। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষ ঝিল্লী, কোষ প্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি থাকে না।
- এদের বিপাকীয় এনজাইম এবং পুষ্টি প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।
- এদের কোন জৈবিক কার্যকলাপ যেমন প্রজনন অন্য সজীব কোষ ছাড়া ঘটতে পারে না।
- ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায় এবং তলানিও করা যায়।
- জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার ন্যায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

অকোষীয় ভাইরাসে দু'রকমের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে একে জীব ও জড়ের মধ্যকার সেতুবন্ধন বলা হয়। প্রাণ-রসায়নবিদগণ ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু অণুজীব বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসের জীব বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন।

ভাইরাসের গঠন : বিভিন্ন ভাইরাসের গঠন বিভিন্ন রকমের। তবে ভাইরাসের গঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ভৌত গঠন এবং রাসায়নিক গঠন।

ভাইরাসের ভৌত গঠন- ভাইরাস দেহের কেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্রীয় বস্তু। কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থান করে ক্যাপসিড আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণুর বিন্যাসের উপরই ভাইরাসের আকার-আকৃতি নির্ভর করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাব ইউনিট নিয়ে গঠিত যাদেরকে ক্যাপসোমিয়ার বলা হয়। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান ভাইরাসভেদে বিভিন্ন রকম হয়। এর বহিঃস্থ আবরণ মসৃণ, আবার কখনও কণ্টক যুক্ত হতে পারে। কোন কোন ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে অন্য একটি আবরণ থাকে।

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন- রাসায়নিকভাবে ভাইরাসে দুটি উপাদান থাকে। যথা- নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন। ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থান করে নিউক্লিক অ্যাসিড। এটি একটি বংশগতি নির্ধারক পদার্থ। নিউক্লিক অ্যাসিড দু'ধরনের। যথা- DNA ও RNA। অন্যান্য জীবদেহে একইসাথে DNA ও RNA অবস্থান করলেও ভাইরাস দেহে একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে না। ক্যাপসিড আবরণটি অসংখ্য প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত। ক্যাপসিড আবরণের এক একটি প্রোটিন অণুকে ক্যাপসোমিয়ার বলা হয়। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। এরা নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করে, ভাইরাসকে পোষক দেহে সংক্রমণে সাহায্য করে এবং অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। কোন কোন ভাইরাসে (যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস এবং HIV ইত্যাদি) ক্যাপসিডের বাইরে জৈব পদার্থের একটি আবরণ থাকে। এটি লিপিড, লিপোপ্রোটিন, শর্করা বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। লিপিড বা লিপোপ্রোটিনের এক একটি স্তরকে পেপলোমিয়ার বলা হয়। লিপোপ্রোটিনের আবরণ দিয়ে গঠিত ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলা হয়।

T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের গঠন : প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সকল ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে T_2 ব্যাকটেরিওফায সবচেয়ে পরিচিত ভাইরাস। এর গঠন সম্পর্কেও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে জানা গেছে। এটি ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। তাই এর নাম ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণকারী। এটি সর্বাধিক পরিচিত ব্যাঙাচি আকৃতির একটি DNA ভাইরাস। বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি (১৯১৭) ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায ভাইরাস নাম দেন। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়। যথা- মাথা ও লেজ।

মাথা- মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভূজাকৃতির এবং প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত। এর দৈর্ঘ্য ৯৩-১০০ nm (ন্যানোমিটার) এবং প্রস্থ ৬৫ nm। মাথার স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বিসূত্রক একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে DNA গঠিত। এতে প্রায় ১৫০টি জিন থাকে। মাথার অধিকাংশ স্থানই ফাঁপা বলে মনে হয়।

লেজ- মাথার পরবর্তী লম্বা সরু অংশটিকে বলা হয় লেজ। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫- ২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির ন্যায় একটি কলার আছে এবং লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের ন্যায়। এর অভ্যন্তরে কোন DNA থাকে না। লেজের নিচের দিকে ১টি বেসপ্লেট, কাঁটার মত স্পাইক এবং ছয়টি স্পর্শক তন্তু থাকে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে লাইসোজাইম নামক এনজাইম

থাকে যা পোষক কোষের আবরণ বিনষ্ট করতে পারে। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে ভাইরাস পোষকের দেহে অবস্থান করে এবং কাঁটা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে।

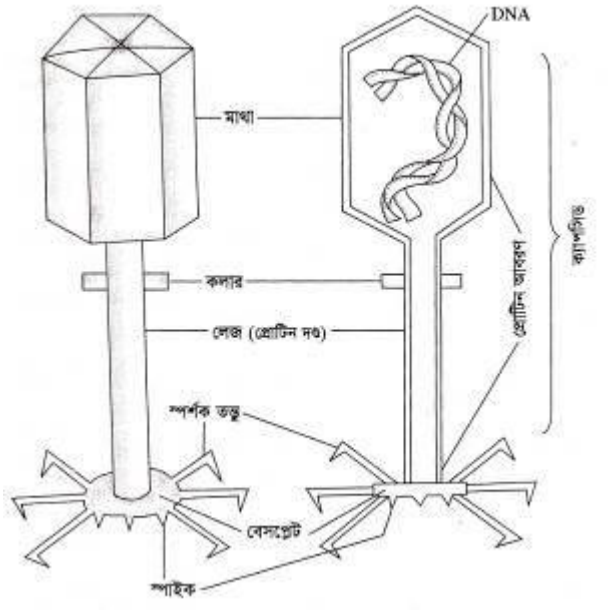

চিত্র ৫.১.১ : T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের গঠন

টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) গঠন : এটি একটি দন্ডাকৃতির RNA ভাইরাস। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় ১৭ গুণ। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ nm (কারও কারও মতে ৩০০ nm) এবং প্রস্থ ১৫ nm (কারও কারও মতে ১৮ nm)। RNA এবং প্রোটিন দিয়ে টোবাকো মোজাইক ভাইরাসটি গঠিত। এ ভাইরাস তামাক পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট করে সাদা সবুজ মোজাইকের মত সৃষ্টি করে বলে এদের টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বলা হয়। এর বাইরে একটি পুরু প্রোটিনের আবরণ থাকে। এতে প্রায় ২২০০ ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রত্যেকটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে এক সূত্রক RNA কোর থাকে। RNA সূত্রটি ৬৫০০ নিউক্লিয়োটাইড দ্বারা গঠিত। ওজন এর দিক বিবেচনায় এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন।

(ক)

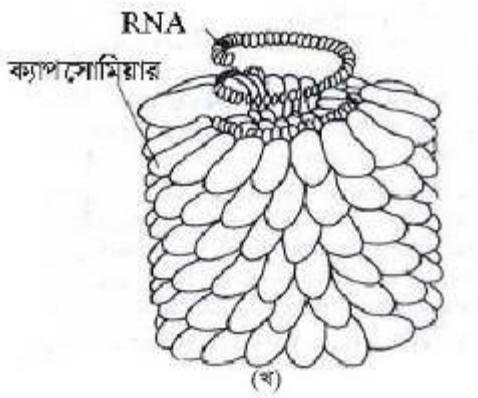

(খ)

চিত্র ৫.১.২ : (ক) তামাক পাতায় মোজাইক রোগ এবং (খ) TMV ভাইরাসের গঠন

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ভাইরাস নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব এমনকি অকাল মৃত্যুও হতে পারে। স্বল্প পরিসরে ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর অনেক উপকারও করে। তবে তুলনামূলকভাবে ভাইরাস মানুষের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে থাকে।

ভাইরাসের অপকারিতা

১। বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর নানা রকমের রোগ উৎপন্ন করে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রোগের নাম, পোষকের নাম এবং ভাইরাসের নাম হলো-

ভাইরাসের নাম	পোষকের নাম	রোগের নাম
এইচআইভি (HIV)	মানুষ	এইডস্
ফ্ল্যাভি ভাইরাস	মানুষ	ডেঙ্গু
র‍্যাবিস ভাইরাস	মানুষ	জলাতঙ্ক
ভেরিওলা ভাইরাস	মানুষ	গুটিবসন্ত
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা
অ্যাডিনো ভাইরাস	মানুষ	নিউমোনিয়া
হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস	মানুষ	ভাইরাল হেপাটাইটিস/জন্ডিস
ইবোলা ভাইরাস	মানুষ	কোষের লাইসিস
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	মানুষ ও শূকর, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু
নিপাহ ভাইরাস	মানুষ	সার্স
ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস	গরু	গো-বসন্ত
ফুট এন্ড মাউথ ভাইরাস	গরু, ভেড়া, ছাগল এবং মহিষ	পা ও মুখের ক্ষত
রুবিওলা ভাইরাস	মানুষ	হাম
পোলিও ভাইরাস	মানুষ	পোলিওমাইলাইটিস
হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস	মানুষ	হার্পিস

ভাইরাস নানা রকম প্রাণীর মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণীর অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়।

২। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের প্রায় ৩০০ ধরনের রোগ ভাইরাস দিয়ে সংঘটিত হয়। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রোগের নাম, পোষকের নাম এবং ভাইরাসের নাম হলো-

ভাইরাসের নাম	পোষকের নাম	রোগের নাম
মোজাইক ভাইরাস	তামাক, ফুলকপি, শিম ও শসা	মোজাইক
পিআরএসভি ভাইরাস	পেঁপে	রিং স্পট
বুশিষ্ট্যান্ট ভাইরাস	টমেটো	বুশিষ্ট্যান্ট
টারনিপ ইয়েলো ভাইরাস	শালগম	পীত
টুংগ্রো ভাইরাস	ধান	টুংগ্রো
বানচি টপ ভাইরাস	কলা	বানচি টপ

৩। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস- মানুষের উপকারি কিছু ব্যাকটেরিয়াকে ফায ভাইরাস ধ্বংস করে।

ভাইরাসের উপকারিতা : বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যথা-

১। বসন্ত, পোলিও, এবং জলাতংক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।

২। ভাইরাস হতে জন্ডিস রোগের টিকা তৈরি করা হয়।

৩। ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যা বা জিন প্রকৌশল এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪। ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত আমাশয় রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

৫। কতিপয় ভাইরাস ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমন করা সম্ভব হয়েছে।

৬। জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া, অভিব্যক্তি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার চাবিকাঠি হলো ভাইরাস, কেননা ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

৭। লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা দাগ পড়ে, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্যও বাড়ে।
এভাবেই ভাইরাস আমাদের উপকার এবং অপকার দুটোই করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে পাঁচটি উদ্ভিদ ভাইরাস ও পাঁচটি প্রাণী ভাইরাসের নাম লিখুন			

সারসংক্ষেপ

ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড (যা কেন্দ্রে থাকে) ও প্রোটিন (যা আবরণ হিসেবে থাকে) দিয়ে গঠিত অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয় এবং তথায় রোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। আমেরিকান বিজ্ঞানী স্ট্যানলি (Stanley) ১৯৩৫ সালে তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাসকে পৃথক করে কেলাসিত করেন। তিনি সেজন্য ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানী এন. ডব্লিউ. পিরি (N.W.Piri) এবং এফ. সি. বাওডেন (F.C.Bawden) ১৯৩৭ সালে ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং বলেন নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে ভাইরাস দেহ গঠিত। ভাইরাসে দু'রকমের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে একে জীব ও জড়ের মধ্যকার সেতুবন্ধন বলা হয়। প্রাণ-রসায়নবিদগণ ভাইরাসের জড় বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু অণুজীব বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসের জীব বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। বিভিন্ন ভাইরাসের গঠন বিভিন্ন রকমের। তবে ভাইরাসের গঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ভৌত গঠন এবং রাসায়নিক গঠন। T_2 সর্বাধিক পরিচিত ব্যাঙাচি আকৃতির একটি DNA ভাইরাস। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি এ ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায ভাইরাস নাম দেন। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়। যথা- মাথা ও লেজ। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ভাইরাস নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব এমনকি অকাল মৃত্যুও হতে পারে। তবে ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর অনেক উপকারও করে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভাইরাস মানুষের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। T_2 ভাইরাসের দেহকে কয়টি অংশে ভাগ করা যায় ?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

i. জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটে ii. অকোষীয় iii. কোষীয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৫.২ ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবন চক্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফায সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	ফায, লাইটিক চক্র, লাইসোজেনিক চক্র

ফায : ফায একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐসব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। ফায এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং এক সময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়। তাই যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলা হয়। যেমন- T_2 ব্যাকটেরিওফায।

T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি : বিশেষ উপায়ে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিটি নতুন ভাইরাস দেখতে হুবহু একই রকম হয়। T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধির পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

একটি পরিপূর্ণ ভাইরাস কখনও পূর্বস্থিত কোন ভাইরাস থেকে সরাসরি উদ্ভুত হয় না। এছাড়া ভাইরাস অকোষীয়। তাই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি পদ্ধতিকে জীবন চক্র না বলে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া বলা হয়। ব্যাকটেরিওফায প্রধানত লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তবে কখনও কখনও লাইসোজেনিক চক্রের মাধ্যমেও সংখ্যা বৃদ্ধি করে। T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো। কারণ এর সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

লাইটিক চক্র : T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের লাইটিক চক্রটি ৫টি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা- ধাপ-১ : সংযুক্তি, ধাপ-২ : ফায প্রবেশ, ধাপ-৩ : অনুলিপন, ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া এবং ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি।

ধাপ-১ : সংযুক্তি- T_2 ব্যাকটেরিওফায সাধারণত *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ফায প্রোটিনের জন্য রিসেপ্টর সাইট থাকে। ফায ভাইরাসের লেজ ও স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের রিসেপ্টর সাইটে আটকে যায়। কারণ এ সময় রিসেপ্টর সাইটের প্রোটিন এবং ফায ভাইরাসের স্পর্শক তন্তুর প্রোটিনের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ধাপ-২ : ফায প্রবেশ- ফায ভাইরাসটির লেজের যে স্থান ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর স্পর্শ করে সে স্থানে কিছু এনজাইমের আবির্ভাব হয়। ফলে কোষ প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়। এ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফায ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) পোষক কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং ভাইরাসের ক্যাপসিড বা শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরেই থেকে যায়।

ধাপ-৩ : অনুলিপন- *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ফায ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন এনজাইমের আবির্ভাব ঘটে। ফলে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের ক্রোমোসোম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ এর DNA অণুটি খন্ড বিখন্ড হয়। তখন ফায ভাইরাসের DNA পোষক কোষের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। কাজেই *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষে ফায DNA এর কোনও প্রতিযোগী থাকে না। এছাড়া মুক্ত হওয়া ফায DNA কোষের রাইবোসোম, tRNA, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং নিজের ইচ্ছা মত নতুন ফায DNA প্রতিলিপন করে। পরবর্তীতে কোট প্রোটিন মাথা, লম্বা লেজ, স্পর্শক তন্তু এবং স্পাইক পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি করে।

ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া- *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিটি ফায DNA এক একটি কোট প্রোটিনের মাথার অংশে প্রবেশ করে। পরে ক্রমান্বয়ে মাথার অংশের সাথে লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিওফায গঠিত হয়।

ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি- *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিওফায তৈরি হওয়ার পর ফায একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি করে। ফলে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর বিদীর্ণ হয়। তখন নতুন সৃষ্ট ব্যাকটেরিওফাযসমূহ মুক্তভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে। মুক্ত হওয়া প্রতিটি ফায এক একটি নতুন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামকে আক্রমণ করতে সক্ষম।

কোষ প্রাচীর বিদীর্ণ হওয়াকে লাইসিস বলা হয়। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে অসংখ্য ফায ভাইরাস সৃষ্টি হয়।

লাইসোজেনিক চক্র : লাইটিক চক্রে ফায DNA, *E. coli* কোষে প্রবেশ করে কোষের DNA কে নষ্ট করে কিন্তু লাইসোজেনিক চক্রে ফায DNA, *E. coli* কোষে প্রবেশ করে কোষের DNA কে নষ্ট করে না বরং *E. coli* এর DNA এর সাথে সংযুক্ত হয়। *E. coli* এবং ফায এর সংযুক্ত DNA কে বলা হয় প্রোফায। *E. coli* কোষ ফায DNA সহ দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। তবে প্রয়োজন হলে পোষক DNA থেকে ফায DNA পৃথক হয়ে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

চিত্র ৫.২ : T_2 ব্যাকটেরিওফায এর লাইটিক চক্র

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে লাইটিক চক্রের ধাপগুলো লিখুন

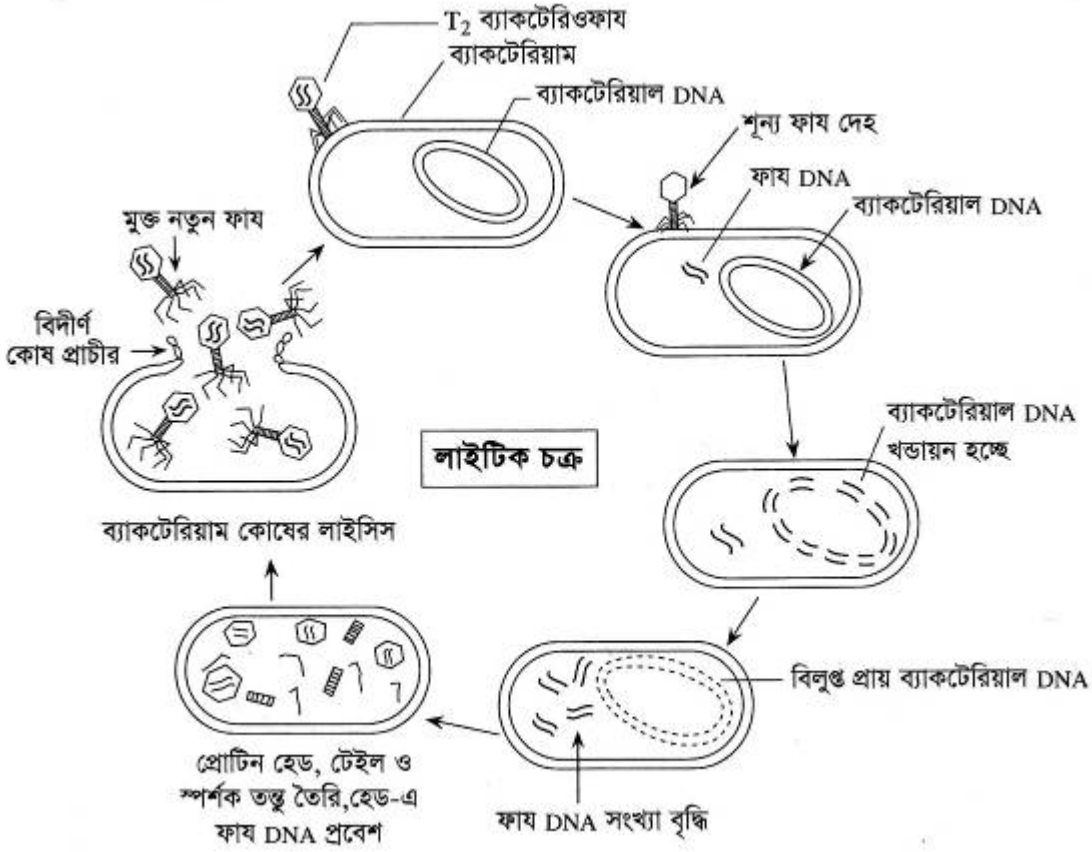

সারসংক্ষেপ

ফায একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐসব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। ফায এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং এক সময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়। তাই যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলা হয়। যেমন- T_2 ব্যাকটেরিওফায। T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের লাইটিক চক্রটি ৫টি ধাপে সংঘটিত হয়। যথা- ধাপ-১ : সংযুক্তি, ধাপ-২ : ফায প্রবেশ, ধাপ-৩ : অনুলিপন, ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া এবং ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে কত মিনিটে অসংখ্য ফায ভাইরাস সৃষ্টি হয় ?

(ক) ১০ (খ) ২০ (গ) ৩০ (ঘ) ৪০

২। T_2 ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের লাইটিক চক্রের প্রধান ধাপগুলো হলো-

i. সংযুক্তি ii. অনুলিপন iii. নতুন ভাইরাস মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৫.৩ পেঁপের রিং স্পট রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পেঁপের রিং স্পট রোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেঁপের রিং স্পট রোগের লক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেঁপের রিং স্পট রোগের প্রতিকার উল্লেখ করতে পারবেন।
- পেঁপের রিং স্পট রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	PRSV, প্লুনিং

রিং স্পট : ভাইরাসের আক্রমণে পাতার উপর কিছুটা অঞ্চল ঘিরে গোলাকার বা হরিদ্রাভ দাগ সৃষ্টি হয়। এ রকম লক্ষণকে রিং স্পট বলা হয়। এটি ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ফলে আমাদের মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন হয়। ভারতে ১৯৪৮ সালে প্রথম এ রোগটি লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই পেঁপে চাষ করা হয়। এটি একটি অর্থনৈতিক ফসল। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে পেঁপে চাষ করা হয়। এটি একটি লাভজনক পেশা। অন্যান্য ফসলের ন্যায় পেঁপেরও নানা রকমের রোগ বালাই হয়। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো রিং স্পট। এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এটি এতই মারাত্মক যে এর ফলে ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়।

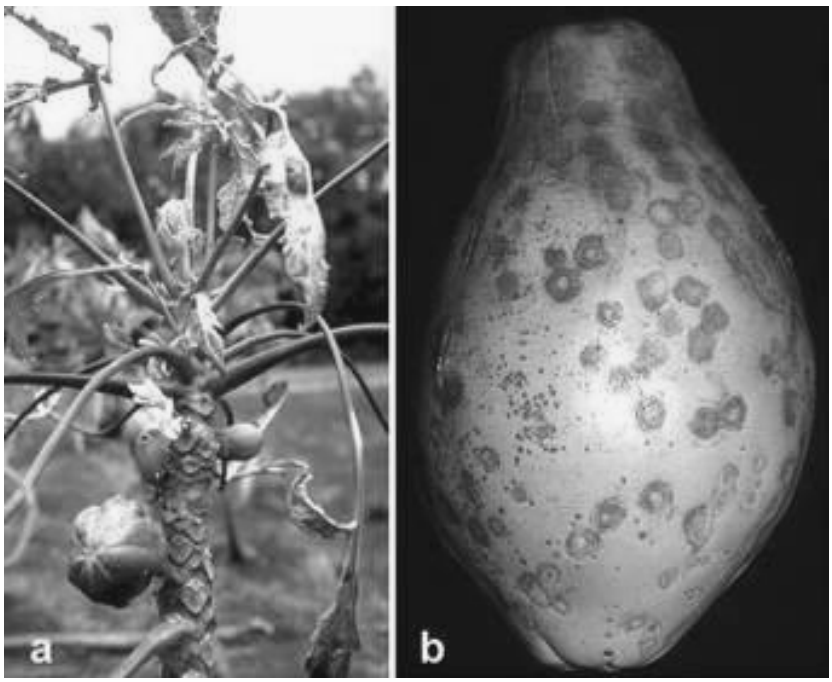

চিত্র ৫.৩ : (a) আক্রান্ড় পেঁপে গাছ এবং (b) আক্রান্ড় ফল

রিং স্পট রোগের কারণ : Papaya ring spot virus বা PRSV নামক ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিং স্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি কিছুটা দন্ডাকৃতির। এটি ৭৬০-৮০০ nm লম্বা এবং ব্যাস ১২ nm । এর ক্যাপসিডের বাইরে কোনও আবরণ থাকে না। এটি একটি RNA ভাইরাস। ভাইরাসটির দুটি প্রকরণ। যথা : PRSV-P এবং PRSV-W। এর মধ্যে PRSV-P দ্বারা পেঁপের রিং স্পট রোগ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও এটি মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা, আমেরিকা, চীন, তাইওয়ান, ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অনেক দেশে PRSV-P এর প্রকোপ দেখা যায়। এ রোগ এফিড দ্বারা ছড়ায়। (এখানে Aphids = *Aplus gossypii*, *Myzus persicae*)।

রিং স্পট রোগের লক্ষণ : PRSV-P ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গোলাকার দাগ প্রকাশ পায়। দাগের প্রকৃতি হলো এরা কেন্দ্রাভিমুখী। পেঁপের রিং স্পট এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দৃশ্যমান হয়-

১। কান্ড, পাতার বোঁটা এবং ফলে গাঢ় সবুজ গোলাকার দাগ সৃষ্টি হয়। দাগগুলো তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত থাকে।

২। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের উপরের পাতায় লক্ষণ আগে প্রকাশ পায়।

৩। আক্রমণের মাত্রা খুব বেশি হলে পাতায় বহুল পরিমাণে মোজাইক সৃষ্টি হয়, পাতার আকার ছোট হয়, গাছের মাথায় বিকৃত আকৃতির ক্ষুদ্রাকার কিছু পাতা লক্ষ করা যায়। অন্যান্য পাতা ঝরে যায়। কখনও কখনও পাতার কেবল শিরাগুলো থাকে।

৪। পেঁপে হলুদ হয়, গোলাকার দাগ দেখা যায় এবং আকার ছোট হয়। অনেক সময় পুষ্ট হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে।

৫। পেঁপের স্বাদ বিশেষ করে মিষ্টতা নষ্ট হয় এবং পেপেইন এর পরিমাণ হ্রাস পায়।

৬। ফলন ৯০% পরিমাণ পর্যন্ত হ্রাস পায়।

রিং স্পট রোগের প্রতিকার

১। চাষকৃত জমিতে পেঁপে গাছে রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত গাছগুলো জমি থেকে তুলে ফেলতে হবে। তুলে ফেলা গাছগুলো মাটি চাপা দিতে হবে অথবা আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে।

২। জাল দিয়ে পেঁপে গাছসহ পুরো জমি ঢেকে দিতে হবে। এর ফলে এফিড দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত হতে পারবে না।

৩। পেঁপে গাছে পেস্টিসাইড স্প্রে করা যেতে পারে। এতে এফিডের বংশসহ ধবংস হবে। পেঁপের চারা লাগানোর শুরু থেকে নিয়মিত স্প্রে করলে এফিড দ্বারা রোগ ছড়াবে না।

৪। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি বন্ধ রাখতে হবে। এতে কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগ ছড়াবে না। একে প্রুনিং বলা হয়।

রিং স্পট রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১। রোগ ছড়িয়ে পড়া এলাকায় পেঁপের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর দূরে কোন এলাকায় রোগমুক্ত চারা দিয়ে চাষ শুরু করতে হবে।

২। মৃদু প্রকৃতির PRSV পোষক উদ্ভিদে প্রবেশ করাতে হবে। এতে গাছগুলো ভাইরাস প্রতিরোধী হবে। অর্থাৎ গাছে অ্যান্টিবডি তৈরি করা।

৩। চারা গাছ তৈরি করার জন্য প্রকটভাবে রোগাক্রান্ত পেঁপে গাছের চারা ব্যবহার না করা।

৪। ট্রান্সজেনিক জাত ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ PRSV দ্বারা ট্রান্সজেনিক জাত আক্রান্ত হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে রিং স্পট ভাইরাসের দুটি প্রকরণের নাম লিখুন

সারসংক্ষেপ

ভাইরাসের আক্রমণে পাতার উপর কিছুটা অঞ্চল ঘিরে গোলাকার বা হরিদ্রাভ দাগ সৃষ্টি হয়। এ রকম লক্ষণকে রিং স্পট বলা হয়। এটি ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের ফলে আমাদের মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন হয়। ভারতে ১৯৪৮ সালে প্রথম এ রোগটি লক্ষ করা যায়। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো রিং স্পট। এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এটি এতই মারাত্মক যে এর ফলে ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়। Papaya ring spot virus বা PRSV নামক ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিং স্পট রোগ হয়। PRSV-P ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গোলাকার দাগ প্রকাশ পায়। দাগের প্রকৃতি হলো এরা কেন্দ্রাভিমুখী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। রিং স্পট রোগটি ভারতে কত সালে প্রথম দেখা দেয় ?

(ক) ১৯৪৮ (খ) ১৯৪৯ (গ) ১৯৫০ (ঘ) ১৯৫১

২। পেঁপের রিং স্পট রোগের লক্ষণ হলো-

i. ভাইরাসের আক্রমণের ফলে গোলাকার দাগ প্রকাশ পায়

ii. দাগগুলো কেন্দ্রাভিমুখী

iii. দাগগুলো তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। পেঁপের রিং স্পট রোগের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো হলো-

i. জাল দিয়ে পেঁপে গাছসহ পুরো জমি ঢেকে দিতে হবে

ii. পেঁপে গাছে পেস্টিসাইড স্প্রে করা যেতে পারে

iii. রোগাক্রান্ত পেঁপে গাছের পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি বন্ধ রাখতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

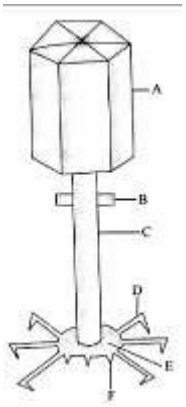

পাশের চিত্রগুলো লক্ষ করুন এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

(ক) ভাইরাস কী ?

(খ) ভাইরাসের একটি জীব ও একটি জড় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(গ) পাশে উল্লিখিত চিত্রটির A, B, C, D, E ও F অংশ চিহ্নিত করুন।

(ঘ) উক্ত চিত্রে C চিহ্নিত অংশের চেয়ে A চিহ্নিত অংশের গঠন বেশ জটিল উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ